কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে-যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই

কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।

তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার হাস আরও বলেছেন, তারা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে।

কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে হাসের কথায় ভিন্নমত যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কথায় ভিন্নমত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে জানিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এরপরই গণমাধ্যম নেতা ও বিশ্লেষকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আর একদিন পরেই পিটার হাসের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বা ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট। তারা জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল, বিরোধী দল ও ব্যক্তিত্ব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর প্রযোজ্য।

গত সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার স্পষ্ট করে বলেন, ‘গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নয়, বরং বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপরই ভিসানীতি কার্যকর হয়েছে।’

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে। পিটার হাসের এই বক্তব্যের

দুইদিন আগে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানায়।

এর আগে, গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে কেউ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। এমনকি তার পরিবারের সদস্যরাও মার্কিন ভিসা থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু গণমাধ্যমের কথা আলাদাভাবে কখনো উল্লেখ করা হয়নি। পিটার হাস হঠাৎ করে কোন পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে বক্তব্য দিলেন সেটি এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজন্ক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা আরেকটি দেশের গণমাধ্যমের ওপর আরোপ করার সুযোগ থাকবে কেনো?“

গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেন দেশের এক বেসরকারি টেলিভিশনের ওয়াশিংটন প্রতিনিধি। এ সময় রাষ্ট্রদূত যা বলেছেন, তার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি বলেন, ভিসা নীতির আওতায় কারা পড়েছেন নির্দিষ্ট করে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে এটি বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এর আওতায় পড়বেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা।

বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানান মিলার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেওয়ার জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়নি। বরং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এ ভিসা নীতি।